ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

“কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি” শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনের মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলি হলো দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় তিনটি: বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি টিআইবি পর্যবেক্ষণ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবির পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন (১৮ নভেম্বর ২০২৪), এবং পরবর্তীতে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন (৪ আগস্ট ২০২৫) প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক এই গবেষণায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর দেড় বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা; উল্লিখিত কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং এসব কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা। এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো-বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম; রাষ্ট্রীয়/সরকারি বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, এবং সামরিক বাহিনীর ভূমিকা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত); সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট হতে উৎস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময় হলো ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় যেসব উল্লেখযোগ্য বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ), নির্বাচন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, আর্থিক খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধ এবং রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসহ সেনাবাহিনী ভূমিকা।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নে বহুমুখি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের পরিপন্থী বিধান অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতিস্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। জুলাই সনদের বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিরোধের প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্বাচনী কার্যক্রম চলমান ছিল, তবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একদিকে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা – এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা; প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করার বিষয়গুলো লক্ষণীয় ছিল। এছাড়া সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে – সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা – সর্বোপরি সংস্কারের নামে গৃহীত উদ্যোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো যাত্রা করেছে সরকার। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়নি। সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ছিল। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া – দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, অর্থের উৎসের অস্বচ্ছতা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, এবং প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টার পুরনো সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক; সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায় বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পূরণ করতে সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের অগ্রাহ্য করার প্রবণতা ছিল। বিভিন্ন সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের মধ্যে নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থাকলেও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন এবং নাগরিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণার বিস্তার হয়েছে। একইসঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নিশ্চিত হয়নি। পূর্বের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম এখন রাষ্ট্র-বহির্ভূত গোষ্ঠীর (বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ও উগ্রবাদী সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী) দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রও তাদের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ এক্ষেত্রে। অন্যদিকে গণমাধ্যমের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ৭: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কী?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ের সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ৮: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****